পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

সংকলন ও সম্পাদনা
নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

"তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে"

"আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো"—এ অমোঘ উচ্চারণ পৃথিবীতে কজন করতে পারেন। কজন পারেন নিজের এই কথাকে সত্যি প্রমাণিত করে মৃত্যুর পরেও বছরের পর বছর মানুষের প্রাণে একইভাবে বেঁচে থাকতে। কিন্তু তিনি পেরেছেন। আজও বিশ্বমানবের কাছে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের তিনিই শেষকথা। শুধু সাহিত্য কেন, সংগীত, নৃত্য, নাটক কিংবা শিক্ষাভাবনা, সমাজচিন্তা, ধর্মদর্শন, স্বদেশ সংস্কার অথবা আমাদের জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক জীবনে উন্নয়ন ও এগিয়ে চলার প্রসঙ্গে আজও অবধারিতভাবে তাঁরই উজ্জ্বল উপস্থিতি। আজও তাঁকে ঘিরে কত প্রশ্ন, কত বিস্ময়, কত গবেষণা, কত নতুন তথ্যের উদ্বোধন। চোখের আলোয় তাঁকে আজ দেখা যায় না সত্য কিন্তু আমাদের অন্তরের বীণায় যে সুর ওঠে সেখানে রবীন্দ্রসৃষ্টির অমেয় রাগিণীই যে শোনা যায় কখনও সচেতনভাবে আবার কখনও চুপিসাড়ে। আবার বহির্জগতে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আমরা জ্ঞানে অথবা অজান্তেই কখন থেকে যে অনুসরণ করে চলেছি জানিনা। পথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের মতোই আমাদের অনন্তর রবি-প্রদক্ষিণ।

রবীন্দ্রনাথ কোথায় তাঁর পূর্বগামী কিংবা পরবর্তীদের ছাপিয়ে আজও সমানভাবে আলোচিত তা নিয়ে আলোচনার তো শেষ নেই। আসলে যাঁর শেষ নেই তাঁকে নিয়ে শেষকথা কে বলবে! আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি তাঁর ছিল এক অসামান্য গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর অভূতপূর্ব বাক্ প্রকাশের ক্ষমতা। তাঁর দৃষ্টি জগৎজীবনের দৃশ্যমান বস্তুরাশিকে ভেদ করে বিশ্বমানবের অন্তর রহস্য উদ্‌ঘাটনে ছিল সতত ক্রিয়াশীল এবং তারই সঙ্গে তাঁর অনন্য বাক্‌বৈভব যুক্ত হয়ে তাঁকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে কালজয়ী সম্মান। যে সমাজ, পরিবার এবং কালের পটভূমিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ এবং পরিণতি সেখানে দেশ জাতির ঐতিহ্য এবং সংস্কারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কারের ঊর্ধ্বে যে সর্বজনীন ভাব, বিশ্বজনীন আদর্শ, চিরন্তন সৌন্দর্য, শাশ্বত সত্য, কল্যাণময়ী মঙ্গল—খণ্ড জীবনের টুকরোগুলোকে জুড়ে জুড়ে অখণ্ড জীবনপ্রবাহ, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সেই প্রাণৈষণার সন্ধানেই সেই মানুষের অবিরাম ছুটে চলা।

এই সর্বজনীনতা এবং বিশ্বমুখীনতাই রবীন্দ্রসৃষ্টির মূলমন্ত্র। তাঁর সাহিত্য অঙ্গন থেকে দেশ, জাতি ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে মনুষ্যত্বের সর্বজনীন মহান আদর্শ ঘোষিত হয়েছে বারবার। যুগ প্রভাব ও সংস্কার চেতনা তাঁর শিল্পী চিত্তকে আঘাত করেছে, সে আঘাতে জন্ম হয়েছে নবনব কবিতা, গান, কথাসাহিত্যের। কিন্তু তাঁর প্রতিভা সেখানে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। সেই প্রতিভা যুগ ও সংস্কারের মধ্যে দিয়েই উপনীত

হয়েছে যুগাতীত, সংস্কারাতীত, সর্বকালের, সর্বমানবের সীমাহীন কর্মকাণ্ডের যজ্ঞশালায়। কোনো কোনো শিল্প কর্মে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু মৌলিকভাবে, কল্পনা ও আত্মোপলব্ধি তো থাকেই যা সর্বকালের সর্বমানবের চিত্তকে জয় করতে পারে। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভার এবং মানুষ রবীন্দ্রনাথ যুগপৎভাবে আমাদেরকে যেভাবে জগত ও জীবনের অনন্ত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। উন্মোচিত করেছে নতুন নতুন সৌন্দর্যলোকের যবনিকা, সন্ধান দিয়েছে অননুভূতপূর্ব সত্যের—তাতে তিনি প্রকৃতপক্ষেই হয়ে উঠেছেন কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী।

সাল ২০১০—রবীন্দ্রজন্মের সার্ধশতবর্ষ পালিত হচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি কোণায় কোণায়, বহু বিদগ্ধ, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ পণ্ডিত, তাত্ত্বিক সমালোচক নিজেদের মতো করে রবীন্দ্র অনুধ্যানের মশালটিকে উজ্জ্বল করে তুলছেন। পাড়ায় বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষ, দিল্লির দরবার থেকে বিশ্বসাহিত্য সম্মেলন সর্বত্রই রয়েছেন তিনি। আবার আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' তো তিনিই। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বলতেই তো শিখিনি কোনোদিন, কাঁদতে শিখিনি, হাসতে শিখিনি, তাঁর কাছ থেকে ভাষা না নিয়ে প্রকাশ করতে পারিনি কোনো অনুভব—

"আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোকে-আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে সে নীরব সভা-মাঝারে
দেখেছি চিরজনমের রাজারে।"

আমার সেই 'হৃদয়রাজা' বিশ্বসভায় যে আসনে বসে আছেন তাঁর সেই আলোক- আসনটিতে এই যাতে একটি উজ্জ্বল-মণি যুক্ত করতে পারে তাই এই অক্ষম জনের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

কেন এই সংকলনের জন্য এমন একটি বিষয় বেছে নিলাম সেটি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক কালজয়ী স্রষ্টা যে প্রবহমানতার ধারক সাময়িক পত্রিকা তো সেই প্রবহমানতারই বাহক। তাই গত শতকের পত্র পত্রিকায় যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটিকে আমরা স্মরণ এবং সংরক্ষণ করতে চেয়েছি এইভাবে। এই সংকলনটি আত্মপ্রকাশ করছে এখন কিন্তু গত এক যুগ অর্থাৎ প্রায় দশ-বারো বছর ধরে আমি প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করেছি। একটু একটু করে 'নিধি' কুড়িয়েছি সাময়িক পত্রের ছেঁড়া, ধুলো ভরা, পোকায় খাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া পাতা থেকে। বলাবাহুল্য সে প্রবন্ধের কেন্দ্রে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে রবীন্দ্রনাথের দেশকালের বাঁধভাঙা যে সত্ত্বাকে আজ সহজেই যেভাবে চিনে নিতে পারছি সেটাতো একদিনে সম্ভব হয়নি। সপ্রশংস আলোচনা কিংবা বিরুদ্ধ সমালোচনার হাওয়া সবসময়ই দোলা দিয়েছে তাঁর সৃষ্টির তরণিকে, তাকে গতি দিয়েছে, সদা সর্বদা সচল থেকে তাকে পৌঁছে দিয়েছে নতুন সৃষ্টির ঘাটে ঘাটে যার সিংহভাগ জায়গা নিয়েছে সাময়িকপত্রের পাতাতে। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনাপর্ব থেকেই তো তার ভাগ্যের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল সাময়িকপত্র। বাংলা সাহিত্যের যুগ চিহ্নিত হয়েছে সাময়িকপত্র দিয়ে, যেমন 'বঙ্গদর্শন পর্ব', 'সবুজপত্র পর্ব' কিংবা 'কল্লোল-যুগ'। বাংলায় সাহিত্যিক গোষ্ঠী চিহ্নিত হয়েছেন সাময়িকপত্রের নাম দিয়ে। আর রবীন্দ্রসৃষ্টি আত্মপ্রকাশের প্রথম লগ্নটি

থেকেই কীভাবে সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সে তো আজ এক ইতিহাস। বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ নন—পুরো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। যে পরিবার তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, বালক, ভারতী ও বালক, সাধনার আঁতুড়ঘর সেই পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যটি। একে একে ভারতী, ভারতী ও বালক, হিতবাদী, সাধনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, প্রবাসী, বিচিত্রা থেকে শুরু করে শারদীয়া আনন্দবাজার পর্যন্ত বনস্পতির মতো বিস্তার করে দিয়েছিলেন সাহিত্যের বিচিত্র শাখা। তাঁর জীবনের অর্ধেকের বেশি লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। পাশাপাশি সম্পাদনা করেছেন ভারতী, ভারতী ও বালক, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন কিংবা সাধনার মতো পত্রিকা। এমনটি বহু সময় দেখা যাচ্ছে যে একই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাটি বেরোচ্ছে আবার বেরোচ্ছে তাঁকে নিয়ে, আলোচনা কিংবা সমালোচনা। মাঝে মাঝে সমালোচনার ঝড় বিব্রতও করেছে তাঁকে আমরা দেখেছি আবার ওই পত্রিকার পাতাতেই লেখা দিয়ে তিনি সে ঝড় থামিয়েও দিয়েছেন। মোটকথা সমগ্র রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য এবং সাময়িকপত্র জড়িয়ে গেছে অঙ্গাঙ্গীভাবেই। যেমন যেমন ভাবে এগিয়েছে তাঁর সৃষ্টি এবং কর্মের ক্রম বিকাশের বিবর্তন রেখাটি তেমনভাবে তাঁকে ঘিরে আলোচনার রেখাটিও ক্রমবিকশিত ও ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্র আলোচনার ইতিহাসকে চিহ্নিত করতে গেলে সাময়িক পত্রিকার ভাণ্ডারটিকে উন্মুক্ত করতেই হবে। নতুনভাবে, আসলে এক দুই বছর তো নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্র-পত্রিকার সম্পর্ক শতাধিক বছরের। এ সংকলন হয়ে থাক সে সম্পর্কের চিরন্তন সাক্ষী।

পুরোনো গ্রন্থ কিছুটা রক্ষিত হয় গ্রন্থাগারে কিন্তু সাময়িকপত্র বড়োই অভাগা। আমাদের দেশে সাময়িকপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। গ্রন্থাগারের অন্ধকারে ভাঙা আলমারিতে কিংবা মেঝেতে স্তূপীকৃতভাবে, পোকার খাদ্য হয়ে কিংবা ধুলোভরা আবর্জনা হয়ে কত যে মূল্যবান রত্ন চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছে আমি নিজে চোখে তা দেখেছি।

গত শতকের পত্রপত্রিকাগুলিতো এক একটি খনি। তাদের যথার্থ পরিচয়সমৃদ্ধ ইতিহাস লেখা এখনই প্রয়োজন—প্রয়োজন গত শতাব্দীর বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজনেই। আমি এই সংকলনটির মাধ্যমে শুধু এটিই দেখাতে চাই না যে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ শতকের পত্রিকার পাতা জুড়ে ছিলেন, ভবিষ্যতের কাছে এটাও তুলে ধরতে চাই যে, দেখুন, সে যুগের পত্রিকার মান ও চিন্তাভাবনার প্রসারতাও কেমন ও কতখানি ছিল। দুষ্প্রাপ্য, মহামূল্যবান লেখাগুলির পাশাপাশি কত যে মূল্যবান ছবি (রবীন্দ্রনাথের তো বটেই, অন্যান্য অনেক বিষয়ে) সেখানে রয়েছে এবং সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা বলার ভাষা নেই। ভবিষ্যতে চিন্তাশীল মানুষ এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন আশা রাখি। এই সংকলন সেই বিলুপ্তির পথে চলে যাওয়া পত্র-পত্রিকার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার এক সামান্য উদ্যোগ।

যাই হোক, আমাদের এই সংকলনের জন্য আমায় ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৪০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এই একশো বছরের কয়েকটি প্রধান পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে সমস্ত রচনা আত্মপ্রকাশ করেছিল তার থেকে কিছু কিছু বেছে নিয়েছি। সংকলনটির তিনটি খণ্ডে মোট ১৬৬টি প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলি সংগৃহীত হয়েছে যথাক্রমে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, বসুমতী, বসুধারা, শনিবারের চিঠি এবং দেশ-এর মতো পত্রিকার পাতা থেকে। প্রথম খণ্ডটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে রয়েছে রবীন্দ্রজীবন ও দর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি।

দ্বিতীয়ভাগে রবীন্দ্রপ্রতিভার নানাদিক। অর্থাৎ গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, অঙ্কন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, নাট্য প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি যে প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হয়েছেন সেগুলি স্থান পেয়েছে। তৃতীয়ভাগে

বিভিন্ন উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অথবা তুলনা করে যে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটির দুটি ভাগ। প্রথমভাগে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত নানা মূল্যবান প্রবন্ধ এবং সর্বশেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে স্মৃতিচারণ, তাঁর শতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ইত্যাদি নানা বিচিত্র বিষয়ে লেখা প্রবন্ধাবলি স্থান পেয়েছে। আশা করি এই সংকলন গ্রন্থাগারের অন্ধকারে পড়ে থাকা, হারিয়ে যাওয়া পত্র - পত্রিকাকে নতুনভাবে মূল্যায়নের ঔৎসুক্য জাগাবে এবং বিশ শতকের রবীন্দ্রচিন্তাকে নতুন সাজে পাঠকের দরবারে হাজির করে রবীন্দ্রগবেষণার বহু নতুন দিগন্তের উদ্বোধন ঘটাবে।

বাংলা ১৩০০ শতকের শুরুতেই (বৈশাখ, ১৩০৮) আত্মপ্রকাশ করে 'প্রবাসী' বাংলার বাইরে প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্ররূপে প্রবাসীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এর সম্পাদক ছিলেন বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পত্রের শুভ সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি দিয়ে। আমরা জানি 'গোরা' ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে 'প্রবাসী'র পাতাতেই। আর রবীন্দ্র-আলোচনার দিক থেকে তো কয়েক দশক ধরে প্রবাসী হয়ে উঠেছিল প্রায় 'রবীন্দ্রগবেষণাপত্র'। অন্যান্য সাহিত্যের আলোচনাও প্রবাসীর এক মূল্যবান ঐশ্বর্য।

১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে আত্মপ্রকাশ করে 'ভারতবর্ষ'। সম্পাদক জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ঋগ্বেদীয় স্বস্তি বচন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' কবিতা দিয়ে হয়েছে পত্রিকার শুভ সূচনা। প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে,—"আমাদের সাধনা যে, আমাদের মাতৃভাষাকে সমবেত মানব মণ্ডলীর সম্মুখে গৌরবের সিংহাসনে বসাইয়া তাহার মাথায় মহিমার রাজমুকুট পরাইয়া দিব"—এই সাধনা যে পত্রিকার উদ্দেশ্য সেখানে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ যে পুরোভাগে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কী।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত মাসিক বসুমতী প্রকাশ পায় ১৩২৯-এর বৈশাখে। সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। 'পত্র-সূচনা'য় বলা হল—"ভাবের প্রচার যত অধিক হয়, উন্নতির পথ ততই জাতির পক্ষে সুগম হয়। সেইজন্য আমরা যথাসাধ্য সাহিত্যের সহায়তায় দেশের সেবা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এখানেও নানাজনের নানামতের মধ্যে দিয়ে বারবার মূর্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ। পৃথক প্রবন্ধ তো বটেই নিয়মিত বিভাগগুলি যেমন—'অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ', 'ছোটোদের আসর', 'রঙ্গপট' কিংবা 'নাচ-গান-বাজনা'য় তাঁর অনির্বাণ উপস্থিতি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ, শনিবার আত্মপ্রকাশ করে বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে বাংলা সাহিত্য জগতে ঝড় তোলা পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'। প্রথম সম্পাদক যোগানন্দ দাস, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ থেকে পত্রিকার সম্পাদক হন সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁর বিরোধী মনোভাব সর্বজনবিদিত। হ্যাঁ, একথা সত্যি যে, 'শনিবারের চিঠি' এবং সজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি বাতাবরণই প্রায় তৈরি করে ফেলেছিলেন কিন্তু আমরা আশ্চর্যভাবে লক্ষ করলাম এই দ্বন্দ্বটুকু কেবলমাত্র বাইরে। পত্রিকার পাতার ভেতরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন অবধারিতভাবেই এবং রয়েছেন সসম্মানেই। এমনকি সজনীকান্ত দাস নিজেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাও আমরা দেখতে পাব।

সাময়িক পত্রিকার জগতে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে 'বিচিত্রা'র (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৩৪)। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যের সঙ্গে ছবিকে মিশিয়ে রসাস্বাদনের এক অন্য মাত্রা গড়ে তুলেছিল 'বিচিত্রা'। প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কথা'য় অমল হোম লিখেছিলেন—"সাহিত্য সাধনায় শক্তি ও

সংযম সম্বন্ধে জাগ্রত অথচ উদার দৃষ্টি রাখতে পারলে 'বিচিত্রা'র একটা অভিপ্রায় সফল হবে।" পত্রিকার শুভ সূচনায় ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বিচিত্রা'। এরপরেই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র নন্দলাল বসুর হাতে চিত্রিতরূপায়ণ। এহেন পত্রিকার প্রবন্ধ-সাহিত্য বিভাগের সিংহভাগে যে থাকবেন রবীন্দ্রনাথই তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা থাকে না।

কালিদাস রায় এবং বিশ্বপতি চৌধুরীর সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা 'বসুধারা' আত্মপ্রকাশ করে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে। বাংলা সারস্বত সাধনায় এ পত্রিকা যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করে এই পত্রিকার পাতায়।

সবশেষে 'দেশ' এর প্রসঙ্গ। উল্লিখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র এই পত্রিকাটিই বিশ শতকের গণ্ডি পেরিয়ে এই একবিংশ শতকেও সগৌরবে প্রবহমান। সুতরাং সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-আলোচনার প্রবহমান ধারাবাহিকতা এবং বিবর্তন রেখাটি অঙ্কনে আমরা পাতা উল্টেছি 'দেশ'-এর। দেখেছি রবীন্দ্রচর্চার কী অসামান্য দলিল সেখানে রয়েছে। আর 'প্রবাসী' থেকে 'দেশ'-এ পৌঁছে আমরা যেন একটা বৃত্ত পরিক্রমার সামনে এসেও পৌঁছলাম। প্রবাসীর সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর 'দেশ'-এর প্রকাশক হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তথা আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। রবীন্দ্রজন্মের এই সার্ধশতবর্ষে পৌঁছেও 'দেশ'-রবীন্দ্র আলোচনার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই এগিয়ে চলেছে।

এই পত্রিকা কয়টি থেকে যে প্রবন্ধগুলিকে সংগ্রহ করে আমি সংকলিত করেছি সেগুলিকে প্রথমে বিষয়ানুক্রমিকভাবে এবং তারপর কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। প্রথমখণ্ডের 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা'-কে তুলে ধরেছি পঞ্চশ টি প্রবন্ধে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন খ্যাতমান লেখকদের পাশাপাশি তথাকথিত অখ্যাত জনও। আসলে আমি দেখাতে চেয়েছি সেযুগে সাময়িকপত্র যেমন খ্যাতি-অখ্যাতির মানদণ্ডে লেখা বিচার না করে সাহিত্য ভাবনার কষ্টিপাথরে তাকে বিচার করে প্রকাশ করেছে তেমনি বিজ্ঞজনকে তো বটেই কতদিক থেকে কতভাবে রবীন্দ্রনাথ আপামর জনসাধারণকেও চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। এই খণ্ডের লেখকরা হলেন সর্বশ্রী—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রাধারাণী দত্ত, বিনায়ক সান্যাল, নীহাররঞ্জন রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, জয়দেব রায়, সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, আদিত্য ওহদেদার, পুলিনবিহারী সেন, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, আবু সয়ীদ আইয়ুব, আভা কুণ্ডু, চিন্ময়ী পাঠক, দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরলাবালা সরকার, ত্রিযুগ বাগচী, অপর্ণা সরকার, রত্না রায়, কে এম পাণিক্কর প্রমুখ। এঁদের কলমে উঠে এসেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানাদিক। প্রতিটি প্রবন্ধ বিষয়-বক্তব্যে এত সমৃদ্ধ, এত প্রাঞ্জল, পাণ্ডিত্যে, আবেগে, বিচারবুদ্ধিতে, আন্তরিকতায় এত মনোগ্রাহী যে এগুলি সম্বন্ধে আমার নিজের মত পোষণ করাকে আমি ধৃষ্টতাই মনে করছি। পাঠক নিজেই এই অমৃত-ভাণ্ডারের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হবেন এমনটাই প্রার্থনীয়। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি এ সংকলন প্রস্তুত করতে গিয়ে একদিকে যেমন বিশ শতকের পত্রপত্রিকার ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছি তেমনি এত বিচিত্র, এত গভীর রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যা আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকল। বছরের পর বছর প্রকাশিত হয়ে পত্রপত্রিকা একটা গোটাযুগের চিন্তা চেতনাকে ধরে রাখে। সদ্য অতিক্রান্ত যুগের রবীন্দ্রচর্চার সেই রূপটিকে এই সংকলন কিছুটা হলেও ধরে রাখবে এই আশা।

সবশেষে বলি, যে কোনো সংকলনকেই সবসময় অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। একথা অবশ্যই উল্লেখ্য ঠিক মতো অনুসন্ধান করলে গত শতকে পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংখ্যা সহস্রাধিক হয়ে যাবে

কিন্তু একটি সংকলনে সবটা ধরে রাখা সম্ভব নয়। বিদগ্ধ পাঠকের মনে হতে পারে ওই প্রবন্ধটি দিলে ভালো হত কিংবা ওই পত্রিকাটির উল্লেখ জরুরি ছিল। তাঁদের সব মতামত আমার ভবিষ্যতে চলার প্রেরণা আর এই গ্রন্থের যেটুকু ভালো তাঁর সবটুকুর দাবিদার গ্রন্থের লেখকবর্গ এবং গ্রন্থের প্রকাশক (পুনশ্চ)। এই সুযোগে তাঁদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। মুদ্রণ প্রমাদ কিছু থেকে থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করব। প্রবন্ধ সংগ্রহে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বহরমপুর গার্লস কলেজ লাইব্রেরি, রানাঘাট পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতির কর্মীবৃন্দকে। আমাকে রবীন্দ্র-অনুধ্যানের প্রেরণা দিয়েছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা নেই। আমার বাবা ড. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহায়ক না হলে একাজ আমি করতেই পারতাম না। তাঁকে কীই বা দিতে পারি আলাদা করে। আমার ছোট্ট মেয়ে রাগিণী এবং আমার সমস্ত পরিবার আমার পাশে আছে বলেই আমি এই গবেষণা করতে পেরেছি। তাঁদের সকলকে আমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ধন্যবাদ জানাই।

আমার এ প্রয়াসে ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-গবেষণা নতুন রাস্তার সন্ধান পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আর তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব—

গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র,
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র।

জানুয়ারি ২০১১

নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা
বহরমপুর গার্লস কলেজ

সূচিপত্র

র বী ন্দ্র না থে র সা হি ত্য সা ধ না

সমালোচনার সূচনা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	৩
রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উন্মেষ	সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫
রবীন্দ্রপরিচয়	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ	১৩
বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ	রাধারাণী দত্ত	২৭
রবীন্দ্রকাব্যের অধ্যাত্মসম্পদ	বিনায়ক সান্যাল	৫০
রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা	কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	৫৭
রবীন্দ্রনাথের 'ছোটো গল্প'	নীহাররঞ্জন রায়	৬৭
'সীমার মধ্যে অসীমের পালা'	রমাপ্রসাদ চন্দ	৮০
কাব্যে ঋতুমঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ	জয়দেব রায়	৮৯
রবীন্দ্রসাহিত্যে কর্মের আহ্বান	অভয় চরণ দে	৯৮
সংকেত : রবীন্দ্রনাথ – রাজা	প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য	১০১
রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু	চিন্ময়ী পাঠক	১০৬
রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দোমুক্তি	ত্রিযুগ বাগচী	১০৯
রবীন্দ্রকাব্যে নারী	অপর্ণা সরকার	১১২
রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম	সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	১১৮
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব	মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১২৬
রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা	সরলাবালা সরকার	১৩২
রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যের বাস্তবতা	তারাপদ মুখোপাধ্যায়	১৪২
রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য	কে এম পাণিক্কর	১৫০
প্রেম, মহুয়া ও রবীন্দ্রনাথ	রত্না রায়	১৫৩
রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী	আভালতা কুণ্ডু	১৫৭
রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা	শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়	১৬৭
রবীন্দ্রকাব্যে যৌবনসূচনা	শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৭১
বলাকা-প্রসঙ্গে কবিগুরুর গান	অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়	১৭৮
রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা	আভা কুণ্ডু	১৯২
মহাপুরুষ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	ভবতোষ দত্ত	২০৮

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য	সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	২১২
ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি ও রবীন্দ্রনাথ	আদিত্য ওহদেদার	২২৬
রবীন্দ্রনাথ ও অসমীয়া সাহিত্য	সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	২৩১
আমিয়েলের ছিন্ন জার্নালের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	২৪৬
রবীন্দ্রসাহিত্যে দুঃখের বাণী	কেশবচন্দ্র গুপ্ত	২৫৬
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িকপত্র	পুলিন বিহারী সেন	২৬৫
বাংলা মঙ্গলকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ	দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৫
বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ	দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৪
রবীন্দ্রনাথের গোরা ও শরৎচন্দ্রের নববিধান	বলাই দেবশর্মা	২৯৪
রবীন্দ্র-সৌন্দর্যবোধে অতীত চারণা ও 'কল্পনা' কাব্য	গোপেশচন্দ্র দত্ত	২৯৯
রবীন্দ্রসাহিত্যে দুটি প্রিয় প্রসঙ্গ	জয়ন্তকুমার চক্রবর্তী	৩০৫
রবীন্দ্রকাব্যে গতি	সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য্য	৩০৯
রবীন্দ্রনাথের Fire-flies	সুকুমার দত্ত	৩১৬
'শান্তিনিকেতন' পাঠের ভূমিকা	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৯
রবীন্দ্রসাহিত্যে অতিপ্রাকৃত	গুণেন্দ্র রায়	৩২৮
রবীন্দ্রকাব্যে যৌবনের অন্তরাগ	শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩৩৮
রবীন্দ্র-কাব্যের শেষপর্যায় : জন্মদিন	প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য	৩৪৫
রবীন্দ্ররচনায় শিশু	সন্তোষকুমার রায়চৌধুরী	৩৫৩
রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব	দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৬
"বউঠাকুরাণীর হাট ও বঙ্গাধিপপরাজয়"	অর্চনা মজুমদার	৩৭১
রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য	উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	৩৭৬
প্রেমের দুইরূপ [চণ্ডালিনীর ঝি ও রাজেন্দ্রনন্দিনী]	আবু সয়ীদ আইয়ুব	৩৮৩
রবীন্দ্র-কাব্যে চিত্র সৃষ্টি	ইন্দু রক্ষিত	৩৯৮
অন্যের গ্রন্থে ভূমিকা-লেখক রবীন্দ্রনাথ	আদিত্য ওহদেদার	৪০৬
গ্রন্থ ও লেখকের নাম		৪১৭
ব্যক্তির নাম		৪১৮
রচনার নাম		৪২০
পত্রিকার নাম		৪২৪
প্রতিষ্ঠান		৪২৪

সমালোচনার সূচনা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

কাব্যের সকল শ্রেণী এবং সকল অঙ্গেই কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা আছে। গদ্যে কথাগ্রন্থ বা উপন্যাস, ক্ষুদ্র গল্প বা আখ্যানক, ভ্রমণবৃতান্ত চিন্তাসংগ্রহ ও খেয়াল রচনা আছে এবং তাহা ছাড়া ভাষা সাহিত্য সমাজ রাজনীতি ধর্মতত্ত্ব ও মোক্ষ তত্ত্বের সমালোচনারও অনেক প্রবন্ধ আছে। বাহ্যিক আকৃতির বিচারে যাহাকে সাধারণত মহাকাব্য বলে তাহা তিনি এখনও লেখেন নাই। কিন্তু খণ্ডকাব্যে সকল অঙ্গেই তাঁহার রচনা পড়িয়াছি। গান, গীতিকবিতা কথা কবিতা (narrative poems) প্রাকৃত বর্ণন কবিতা (descriptive poems) প্রশস্তি কবিতা (elegy) আবাহন কবিতা (ode) স্তুতি (hymn) গাথা (ballad) সংলাপ কবিতা (poems in dialoges) কৌতুক কবিতা, চূর্ণক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকের মতো কবিতা কণা প্রভৃতি অনেক পড়িয়াছি। সম্ভবত তিনি কোনো লালিকা (parody) রচনা করেননি। একজন লেখকের এত সার্বভৌমিকতা বিচিত্রতা এবং অনল্পতা বড়ো সহজ রকমের কথা নহে। যিনি অত্যন্ত অধিক রচনা করিয়াছেন তাঁহার সকল কবিতাও যে অতি চমৎকার হইয়াছে একথা বলিতে পারি না; এমন অনেক কবিতায় পড়িয়াছি যাহা আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে। আমি খুঁজিয়া পাতিয়া সেই অপ্রশংসার জিনিস বাছিয়া বাহির করিব না, কেননা তাহাকে সুসমালোচনা মনে করি না। কাব্যের মাহাত্ম্য প্রদর্শনকেই যথার্থ সমালোচনা মনে করি; তবে যে কাব্য অমঙ্গলপ্রদ অথচ তেজস্বী, বিহিত চেষ্টায় সাহিত্য হইতে তাহাকে দূর করাকেও সমালোচনার একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করি।

আমরা আমাদের স্বদেশীয় কবিদিগের যে সম্যক গুণগ্রহণ করিয়া থাকি এরূপ বলিতে পারি না। আমরা একালের শিক্ষায় ইউরোপীয় কাব্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছি। মুগ্ধ হইবারই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিতে পারি না যে এদেশে একালের কবিতায় সরসতা বা সৌন্দর্য নাই। মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে এদেশের লেখকেরা বুঝি কখনও ইউরোপীয় সমকক্ষ হইতে পারিবে না। তাই না পড়িয়াই এদেশের কাব্য উপেক্ষা করিয়া থাকি। জ্ঞানাভিমানীরা যদি এদেশের কাব্যগুলি পড়িয়া নিন্দার ছাইও ঢালেন তবু আমাদের অযত্নে পালিত সাহিত্যের 'মান' একটু বাড়িতে পারে।

আমি ইউরোপে কয়েকজন ভদ্রলোককে শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিহাস কবিতা (আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব) তর্জমা করিয়া শুনাইলাম। তাঁহারা সকলেই ঐ রচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। একজন বিলাতি পত্রের চালক ঐ কবিতাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে জাহাজে কয়েকজন মহিলাকে গল্প শুনাইতে শুনাইতে একদিন রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পটি তর্জমা করিয়া শুনাইয়াছিলাম। সে দিন তাহারা যে আগ্রহে এবং বিস্ময়ে আরও ঐ রকমের গল্প শুনাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা আমি কদাপি ভুলিতে পারিব না। আমরা নাকি স্বদেশ হিতৈষী, তাই এ দেশের লেখকদের কোনো গুণ দেখিতে চাই না।

একদিন সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ হইতে এমন একশত কবিতা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, যেগুলিকে সকলকেই প্রশংসা করিতে হইবে। কালের পরীক্ষায় যদি কাহারও কবিতাগুলির মধ্যে এতগুলিও টিকিয়া যায় তবে সেটা সে কবির কম গৌরবের কথা নহে। যাঁহাদের সুশিক্ষা এবং সুবিচার কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না — তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দোষগুণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখিয়াছি। আমি কবির

কাব্যমাহাত্ম্য প্রদর্শনের সময় সে সব বিরোধী সমালোচনার বিচার করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হইবে। সেইজন্য আমি সযত্নে তাহার কাব্যসমালোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

কবি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। পরিণত বয়সের সুবিচারে অনেক রচনা বাহুল্যবোধে পরিত্যাগ করিবার জন্যই বোধহয় কাব্যগ্রন্থের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কবি যখন কর্মফল কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তখন হয়তো স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে পুনর্জন্ম সত্য না হইলেও, "তাকেই হয়তো করতে হবে তাঁহার লেখার সমালোচনা।" কবি লিখিয়াছেন যে তিনি পরজন্মে সমালোচক হইয়া আসিবেন,—

ততদিনে দৈবে যদি পক্ষপাতী পাঠক থাকে;
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ, এমনি কটু বলব তাকে।
যে বইখানি পড়বে হাতে, দগ্ধ করব পাতে পাতে;
আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ভস্মলোচন।
আমায় হয়ত কত্তে হবে আমার লেখা সমালোচন।

অনেক কবির কাব্যের ইতিহাসেই জানিতে পাই যে অনেক বাল্য রচনা পরিত্যক্ত, পরিবর্তিত বা পরিবর্জিত হইয়াছিল। এই প্রকারের পরিবর্তন যে সকল সময়েই সুবিধাজনক, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষ অংশের যে প্রকার পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ উৎকৃষ্ট কথা-গ্রন্থখানি একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে কালরূপ সমালোচকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো। নূতন ভাব জুটিলে, নূতন কবিতা লিখিলে কিছু ক্ষতি হয় না; প্রাচীনটিকে সংস্কার করিয়া তোলার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। পাঠকেরা যদি কোনো রচনা উপেক্ষা করেন, তবেতো সাহিত্যের বাজারে তাহা কাটিবেই না; আর যদি পাঠকদের অনুরাগ থাকে, তবে, কবির নিজের অবজ্ঞা ও অনাদর জ্ঞাপন করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কবিতার সমালোচনার সময়ে বিশিষ্ট উদাহরণ দিয়া দেখাইব, যে সকল স্থলে ছাঁটা-কাটা কাজটি উপযুক্ত হয় নাই।

কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাটি আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের লেখা। কিন্তু কবিতাগুলি যে একা তাঁহারি দায়িত্বে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নূতন রকমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নয়। একার্যে কবির নিজের হাত ছিল চোদ্দো ভাগ। একথায় আমি নিজে সাক্ষী। কবি, মদনের জন্মের পূর্বের এবং পরের কথার যে দুইটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, ঐ দুইটি বহু পরে লিখিত হইয়া থাকিতে পারে; জানি না। কিন্তু দুইটি ভাব যে একই সূত্র অবলম্বন করিয়া ফুটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুইটি বিভিন্ন স্থানে নিবিষ্ট হওয়াতে কবিতা দুটির প্রাণে প্রাণে যে যোগ ছিল তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। একত্রে এক স্থানে না পড়িলে কবিতার সৌন্দর্য এবং মাহাত্ম্য কদাচ পূর্ণরূপে অনুভব করা যায় না। যখন সর্বাঙ্গে বিক্ষুব্ধ গতিতে তরুণ জীবন খেলিয়া বেড়ায়, যখন উপভুক্ত আলোকে চিন্তার ছায়ালোক নাই, কামনা তখন শরীরী; মদন তখন খেলার সাথী। যুবতীরাই তখন পূণ্য তূণ ভরিয়া সায়ক গড়িয়া দিত; পরখ ছলে তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিত, এবং যমুনার ঘাটে মদনকে দেখিতে পাইলে গাগরী ভাসাইয়া দিয়া—

শাসন তারে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জল রাখিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

কিন্তু তাহার পর? যখন স্নেহ প্রেমের গভীরতা, প্রাণে প্রাণে শত শঙ্কা জাগাইয়া তুলে, সম্ভোগ যখন জ্যোতিরিক্ত; মদন তখন অশরীরী, তখন বাতাসে বেদনার নিশ্বাস, এবং সঙ্গীতে বিলাপধ্বনি জাগিয়া উঠে। দুটি কবিতা একসঙ্গে না পড়িলে চিনিতেই পারি না —

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।

এই একজোড়া কবিতায় সৃষ্টির যেটুকু নূতনত্ব আছে এবং গড়নের যে গুণপনা আছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু নব সংস্করণের দোষে, এইরূপ অনেক স্থলেই কাব্যরস ব্যাঘাত ঘটিবে।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উন্মেষ

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যটিকে আমরা যে অবস্থায় পাই তখন সৃষ্টির অনিয়মের নিবিড় উত্তাপ ও উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হয়ে গেছে। শক্তির প্রবল তাড়নায় নিরালম্ব শূন্যের উপর ভর করে যে ঘূর্ণীপাক আরম্ভ হয়েছিল, লক্ষ্যহীন অনুসন্ধানের মধ্যে আত্মপ্রকাশের গভীর মর্মবেদনায় যে ঘন বাষ্প ও ধূম্ররাশি আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সৌন্দর্যময় আনন্দলোকের সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে "মানসী"তে তার পরিস্ফূর্ত উন্মেষের সন্ধান পাওয়া যায়। কৈশোরক, ভানুসিংহের পদাবলী, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির পরিশোধ, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নানা রূপোচ্চয়ের বিবিধ বিচিত্র সমাবেশে কাব্যলক্ষ্মীর যে সুন্দর ছবিটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল, "মানসী'তে তাই পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা হয়ে পূর্ণ প্রাণের দীপ্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে।

সেইজন্যই আমরা এর পূববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে দেখতে পাই যে কবি বুঝতে পারছেন, যে, তাঁর এমন একটা কিছু বলবার আছে, যা বলতে পারলে তাঁর জীবনের কৃত্য শেষ হয়ে গেল, এবং যা বলবার জন্য তাঁর প্রাণ ছটফট করছে, অথচ, সে কথা তিনি মুখে ফুটে বলে উঠ্‌তে পারছেন না। পাই-পাই করে তা পাচ্ছেন না, ছুঁই-ছুঁই করে তাকে ধরতে পারছেন না; এবং সেই অভাবে তাঁর অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ পর্যন্ত ব্যথার আঘাতে কম্পমান হয়ে উঠেছে।

"মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে;
যে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়ে ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়!
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান, মরে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।"

জন্ম থেকেই কবি অতুল রাজসম্পদের অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন, তাই গোড়া থেকেই আমরা দেখতে পাই যে স্বভাবের সঙ্গে তাঁর মিলন সকল সময়েই অব্যাহত। বাতাস, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তাঁর প্রতিদিনের চারিপাশের বাহিরের জগৎ, সমস্ত জিনিসের সঙ্গে এমন এক নিবিড়

আনন্দগ্রন্থিতে তিনি বদ্ধ ছিলেন এবং তাদের প্রতি স্পর্শে তাঁর হৃদয় এমন করে নেচে উঠত, তাকে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরের মধ্যে চেপে রাখতে পারতেন না। তারা আপনা থেকেই উচ্ছল হয়ে উঠে তাঁকে ছাপিয়ে উঠত। এই আনন্দানুভবের উদ্দাম শক্তিই তাঁকে কাব্যরচনায় নিয়োজিত করেছিল। জগতের সঙ্গে মনুষ্যের সঙ্গে গভীর প্রেমই তাঁর কাব্যশক্তির মূল।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময় —
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়!
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।"

বিশ্বপ্লাবিত প্রেমের ঢেউ যখন কবির প্রাণকে নাচিয়ে তুলত, তখন আর তাঁর মনে ধনের গৌরব স্থান পেত না, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে কাঙালিনী মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, উৎসবের দিনে তার মলিন বসন দেখে তাঁর চক্ষু সিক্ত হয়ে উঠত। আবার তাঁর যৌবনের প্রৌঢ়তা ভুলে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বসে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' গাইতে বসতেন, নয়, 'সাত ভাই চম্পা'-র গল্প বলতে বসতেন। একরত্তি মেয়ে 'বাবলা রাণী'কে দেখে তাঁর কত আনন্দ, পাখির পালকের অনাদর দেখে তাঁর কত ব্যথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলতে হবে যে তখনকার দিনে সাগরের ঢেউগুলি এসে ভেঙে ভেঙে তাঁর গায়ে পড়ে তাঁকে আকুল করে তুলত, কিন্তু সাগরে ভাসতে তিনি তখনও শেখেন নাই। সমস্ত সৌন্দর্যকে এক করে দেখতে পারেন নাই। হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, যখন যেটি আঁকতেন, তা বেশ চমৎকার করেই আঁকতে পারতেন বটে, কিন্তু সে সমস্তগুলিকে নিয়ে এবং সেগুলিকেও ছাড়িয়ে যে এক অনির্বচনীয়, সুষমাময় প্রাণময় ছবি, অসীম ও সসীমের আলোছায়ায় বিচিত্র হয়ে রয়েছে, তার সন্ধান পান নাই। সুর ও ছন্দের হাওয়ায় তাঁর কাব্যের ঘুড়িখানাকে তিনি আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু অনন্তের সুতো যেখানে বাঁধা আছে, —সেই নাটাইটা তখনও তিনি হাতে পান নাই। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর ঘুড়িখানা কোনো অসীমে ছুটে যেতে চাচ্ছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখা দায়, তথাপি তার মধ্যে এমন একটা কীসের অভাব রয়েছে, যাতে তাঁর সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম তাঁর নিজের চারিদিকেই বার বার পাক খেয়ে মরছে। কবি তাঁর নিজের শক্তিকে অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং তার প্রামাণ্যে বুঝতে পারছেন যে লোকে তাঁর কাছে অনেক আশা করে রয়েছে, অথচ, তিনি তা দিতে পারছেন না, আর সেই ব্যথাটা তাঁকে সকল সময়ই অঙ্কুশের মতন আহত করছে।

"সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়,
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে?
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়;
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে,
একতিল না পাইলে দিই অভিশাপ
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে।"

এই যুগের মাধুর্যরসের আস্বাদের মধ্যেও এমন একটা উগ্রগন্ধের আবেশ, এমন একটা মুগ্ধস্বভাব, এমন একটা বিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়, যে, সহজেই বুঝতে পারা যায়, যে, শুধু ঐদিকটা নিয়ে পড়ে থাকতে হলে, বেশিদিন চলতে পারত না। কবির মদির প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁকে পাগল করে রেখেছিল, তিনি সমস্ত জগৎময় একটা প্রেমের স্বপ্ন দেখতেন;—

"আমার যৌবন-স্বপ্ন যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ!
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত,
পরাণে পুলক বিকশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।"

বসন্তকাননে বসন্তসমীরে প্রিয়ার বারতা শুনতে পেতেন। বসন্তের আবেশের মধ্যে মিলন-চুম্বনের স্পর্শ পেতেন; মেঘের পাশে মেঘ দাঁড়ালে তাদের ক্ষণিক মিলনে চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়িও দেখতে পেতেন;—

"আকাশের দুইদিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে
দুইখানি দিশাহারা মেঘ, —কে জানে এসেছে কোথা হতে!
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে,
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।

★ ★ ★ ★

মেলে দোঁহে তবুও মেলে না, তিলেক বিরহ রহে মাঝে—
চেনা বলে মিশিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ;
দুটি চুম্বনের চূড়া ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন চুম্বনের হাস;
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপন-আভাস।
দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল কহিল না কথা,
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনি, লয়ে গেল উষার বারতা।"

কবির সমস্ত দেহ-মন যেন একটা ঝড়ের দোলায় একসঙ্গে কেঁপে উঠেছে; কবি আর নিজেকে নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখতে পারছে না। কবি তখন পঞ্চবিংশতি বর্ষের নবীন যুবক। যৌবনের রঙিন আভায় তাঁর সমস্ত শরীর তখন রিমঝিম করছে। মনের চেয়ে দেহের সৌন্দর্যই তখন বেশি। শরীরকে অবলম্বন করেই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ। তখন সাধনার প্রদীপ্ত অনলে অতনুর তনু ভস্ম হয় নাই, সেইজন্যই 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে কবির বাসনাকে আমরা এত প্রদীপ্ত, এত তীব্র, এত মূর্তিমান রূপে দেখতে পাই।

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন,
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।"

দেহের সাগরের মধ্যে হৃদয় লুকিয়ে রয়েছে, কবি দেহের মধ্যে ডুব দিয়ে তার সন্ধান পেতে চান।

"হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইবে মগন;—
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

★ ★ ★